কাব্যের রূপ ও রীতি

ডঃ তাপস অধিকারী

সহকারী অধ্যাপক, ইসলামপুর কলেজ

আখ্যানকাব্য

'আখ্যান' শব্দের অর্থ মিত আয়তন কাহিনি বা গল্প। কোন আখ্যায়িকা বা আখ্যানবস্তুকে অবলম্বন করে যখন কোন কাব্য রচিত হয় তখন তাকে আখ্যায়িকা কাব্য বা আখ্যানকাব্য বলে চিহ্নিত করা হয়। এই জাতীয় কাব্যে একটি কাহিনি আনুপূর্বিক বর্ণিত হয়। মহাকাব্যের মত এই ধরণের কাব্যে সূচনা, মধ্যভাগ এবং পরিণতি (Begining, Middle and Ending) থাকে। বিভিন্ন ব্যক্তির জীবন ও সংলাপের মধ্য দিয়ে গড়ে ওঠে এই শ্রেণীর কাব্য। তবে এই জাতীয় কাব্যে কাহিনি বা ঘটনাই মূখ্য ভূমিকা নেয়।

সুতরাং বোঝা যাচ্ছে আখ্যানকাব্য মহাকাব্য, গীতিকাব্য ও গাথাকাব্য থেকে অনেকটাই পৃথক। এইধরণের কাব্যের বৈশিষ্ট্য হল যে, এখানে মহাকাব্যের মত রূপ ও রীতির কঠিন নিয়ম থাকে ন। এখানে কোন কাহিনির উপস্থাপনা করতে হয়। আখানকাব্য যেহেতু সহজ-সরল রীতিতে রচিত হয়, তাই এই কাব্যে ছন্দ সম্পর্কে কোন সুনির্দিষ্ট নিয়ম মানা বাধ্যতামূলক থাকে না। বিষয়বস্তুর একমুখীনতা এই ধরণের কাব্যের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য। কাহিনির প্রয়োজনে আখ্যানকাব্যে অনেক চরিত্রের পরিকল্পনা করা হয়, যারা কাহিনিতে নানা ধরণের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়। যেহেতু আখ্যানকাব্য সাধারণত মানব জীবন কাহিনিকে কেন্দ্র করে রচিত হয়, তাই এই ধরণের কাব্যের চরিত্ররা সমাজের কোন না কোন স্তরের প্রতিনিধিত্ব করে।

দেশ বিদেশের ঐতিহাসিক কোন ঘটনা, প্রেম ও রোমাঞ্চ, কোন মানুষের কীর্তিকাহিনি প্রভৃতি বিষয়কে কেন্দ্র করে আখ্যানকাব্য রচিত হতে পারে। ভার্জিলের 'ইনিড', ওভিদের 'মেটামরফিসেস'— অতীতকালের দু'টি প্রসিদ্ধ আখ্যানকাব্য। চসারের লেখা 'ক্যান্টারবেরি টেলস' একটি উল্লেখযোগ্য রোমাঞ্চমূলক আখ্যান কাব্য। ট্যাসোর লেখা 'জেরুজালেম ডেলিভার্ড' মহাকাব্যের আকারে রচিত আখ্যানকাব্য হিসাবে বিবেচ্য। অষ্টাদশ শতাব্দীর কবি রবার্ট বার্নস এবং উনিশ শতকের কবি ওয়াল্টার একাধিক আখ্যান কাব্য রচনা করেছেন। রোমান্টিক যুগের অন্যতম বিখ্যাত কবি কোলরিজের লেখা " The Rhyme of Ancient Mariner"-একটি বিখ্যাত আখ্যানকাব্য।

বাংলাসাহিত্যে মধ্যযুগ থেকে প্রচুর পরিমাণে আখ্যানকাব্য লেখা হয়েছে। মধ্যযুগের প্রথম কবি বড়ু চন্ডীদাসের 'শ্রী কৃষ্ণকীর্তন' কাব্যটিকে আখ্যানকাব্য হিসাবে ধরা হয়। এরপর বাংলা মঙ্গলকাব্য, অনুবাদকাব্য, চৈতন্যজীবনি কাব্যগুলি ধর্মীয় বাতাবরণে রচিত হলেও আখ্যানকাব্য হিসাবে স্বীকৃত। অনুবাদ কাব্যগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল কীর্তিবাস ওঝার 'শ্রীরাম পাঁচালি' এবং কাশীরাম দাসের 'মহাভারত'। আর মঙ্গলকাব্যগুলির মধ্যে মনসামঙ্গল, চন্ডীমঙ্গল, ধর্মমঙ্গল, অন্নদামঙ্গল গুরুত্বপূর্ণ। বৃন্দাবন দাসের 'চৈতন্যভাগবত' এবং কৃষ্ণদাস কবিরাজের 'শ্রী শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত'-কে অনেকেই আখ্যানকাব্যের অন্তর্ভূক্ত করতে চান। এগুলি ছাড়াও সম্পূর্ণ মানব-মানবীর রোমান্টিক প্রণয় কাহিনি অবলম্বনে রচিত আরাকান রাজসভার কবি দৌলত কাজীর 'লোরচন্দ্রাণী বা সতীময়না' এবং সৈয়দ আলাওলের 'পদ্মাবতী' কাব্যটিও মধ্যযুগের দু'টি বিখ্যাত আখ্যানকাব্য। গোপীচন্দ্রের গান, গোরক্ষবিজয় কাব্যেও আখ্যানকাব্যের কিছু কিছু লক্ষণ আছে।

আধুনিকযুগে প্রকৃত আখ্যানকাব্য রচনার সূচনা হয় ঊনবিংশ শতাব্দীর কবি রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাতে। তাঁর 'পদ্মিনী উপাখ্যান'-এর বিষয়বস্তু গৃহীত হয়েছে কর্নেল টডের 'Annals and antiquities of Rajasthan'-গ্রন্থ থেকে। এটি একটি ঐতিহাসিক আখ্যানকাব্য। রানী পদ্মিনীকে কেন্দ্র করে দিল্লির সুলতান আলাউদ্দিন খলজির চিতোর আক্রমণ এবং রাজ্য রক্ষার্থে ভীমসিংহের আত্মত্যাগ এইকাব্যের বিষয়বস্তু। এছাড়াও রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় 'কর্মদেবী', 'সুরসুন্দরী', 'কাঞ্চীকাবেরী' প্রভৃতি আখ্যানকাব্য রচনা করেন।

রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় আধুনিক বাংলা আখ্যানকাব্যের শুভ সূচনা করলেও তাকে পরিপূর্ণতা দেন মধুসূদন দত্ত তাঁর 'তিলোত্তমা সম্ভব' কাব্যটির মধ্য দিয়ে। এই কাব্যে তিলোত্তমাকে কেন্দ্র করে দুই অসুর ভ্রাতা সুন্দ, উপসুন্দের লড়াই বর্ণিত হয়েছে। মধুসূদনের পর হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় 'বীরবাহু', 'ছায়াময়ী' প্রভৃতি আখ্যানকাব্য রচনা করেন। এ সময়কার একটি বিখ্যাত আখ্যানকাব্য নবীনচন্দ্র সেনের 'পলাশীর যুদ্ধ'। এখানে রবার্ট ক্লাইভ ও সিরাজ-উদ্-দৌল্লার যুদ্ধকে কেন্দ্র করে কবি একটি ইতিহাস মিশ্রিত স্বাদেশিক আখ্যান কাব্য রচনা করেছেন। রঙ্গলাল, মধুসূদন, হেমচন্দ্র এবং নবীনচন্দ্ররা আখ্যানকাব্যের যে ধারার

প্রবর্তন করেছিলেন তাকে অনুসরণ করে পরবর্তীকালে অক্ষয় চৌধুরী, ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, শিবনাথ শাস্ত্রী, রাজকৃষ্ণ রায় প্রমুখেরা কিছু কিছু আখ্যানকাব্য রচনার চেষ্টা করেছিলেন।

তবে মধুসূদন থেকে বাংলাসাহিত্যে আখ্যানকাব্যের যে স্রোত প্রবাহিত হয়েছিল তা ধীরে ধীরে মন্দীভূত হয়ে আসে ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে। এসময় বিহারীলাল চক্রবর্তী ও তাঁর অনুগামীদের দ্বারা বাংলা গীতিকবিতার ধারা জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। এই সময় বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ এবং শরৎচন্দ্রের উপন্যাস সমূহ প্রকাশিত হয়। ফলে পাঠক সমাজ কবিতার জন্য গীতিকাব্যের উপর এবং কাহিনির জন্য উপন্যাসের উপর নির্ভর হয়ে ওঠেন। তাই আখ্যানকাব্য তার জনপ্রিয়তা হারায়। ফলে বিংশ শতাব্দীতে এবং বর্তমানে একবিংশ শতাব্দীতেও আর তেমন কোন উল্লেখযোগ্য আখ্যানকাব্য রচিত হয় নি।

গীতিকবিতা

যে কবিতায় কবি তাঁর একান্ত ব্যক্তিগত আবেগ অনুভূতিকে এক সাবলীল ও আন্তরিক গীতিপ্রবণ ভাষায় ব্যক্ত করেন তাকে গীতিকবিতা বলে। কবির প্রগাঢ় ব্যক্তিক অনুভূতির ধারক ও বাহক হল গীতিকবিতা। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় গীতিকাব্যের সংজ্ঞা নির্দেশ করতে গিয়ে বলেছিলেন— ''বক্তার ভাবোচ্ছ্বাসের পরিস্ফুটন মাত্র যাহার উদ্দেশ্য, সেই কাব্যই গীতিকাব্য।'' আর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখেছেন— ''যাহাকে আমরা গীতিকাব্য বলিয়া থাকি অর্থাৎ যাহা একটুখানির মধ্যে একটি মাত্র ভাবের বিকাশ; ওই যেমন বিদ্যাপতির 'ভরা বাদর মাহ ভাদর/শূণ্য মন্দির মোর' সেও আমাদের মনের বহুদিনের অব্যক্ত একটি সুযোগ আশ্রয় করিয়া ফুটিয়া ওঠা।''

গীতিকবিতার ইংরেজি প্রতিশব্দ হল-'Lyric'. এই 'Lyric' শব্দটি এসেছে Lyre থেকে; যার অর্থ 'বীণাযন্ত্র'। বীণাযন্ত্রের সহযোগে অতীতকালে এক প্রকার ছোট ছোট গান গাওয়া হত। এখান থেকেই 'Lyric' কথাটির উদ্ভব। বীণাযন্ত্র বাজাতে বাজাতে বীণাবাদক যেমন আত্মহারা হয়ে পড়েন, তেমনি Lyric-এর মূলেও আছে আত্মমগ্নতা এবং আত্মহারা একটি ভাবুক মন। এখানে কবির নিজস্ব চিন্তা, ভাব বা অনুভুতি প্রকাশ পায়। আনেক সময় কবিরা কোন ব্যক্তি মানুষের ভিতরে প্রবেশ করে তার সুখ-দুঃখ, আশা-আকাঙ্ক্ষা, চাওয়া-পাওয়া, আনন্দ-বেদনা প্রভৃতি সূক্ষ্ম অনুভূতিগুলিকে এধরণের কবিতার মধ্য দিয়ে প্রকাশ করেন।

কবিতাতে চিরকালই কোন না ভাবে কবির ব্যক্তিগত আবেগ-অনুভূতি প্রকাশ পেয়েছে। তবে বাংলা সাহিত্যে যথার্থ গীতিকবিতার সূচনা হয়েছে আধুনিকযুগে ঊনবিংশ শতাব্দীতে। যদিও মধ্যযুগের সাহিত্য বিশেষ করে বৈষ্ণব পদাবলীতে গীতিকবিতার নানা বৈশিষ্ট্য আছে। ঊনবিংশ শতব্দীতে পাশ্চাত্য সাহিত্যের প্রভাবে আধুনিক কালে গীতিকবিতার যাত্রা শুরু। প্রথমে মধুসূদনের 'আত্মবিলাপ' ও 'বঙ্গভূমির প্রতি' কবিতা দু'টিতেই গীতিকবিতার নানা লক্ষণ ফুটে উঠেছিল। এরপর বিহারীলাল চক্রবর্তীর হাতে তার পূর্ণাঙ্গ বিকাশ ঘটে। বিহারীলালের সমসাময়িক অন্যান্য কবিরা গীতিকবিতার চর্চা করে খ্যাতিলাভ করেছিলেন। তবে বাংলা গীতিকবিতাকে সবচেয়ে জনপ্রিয় করে তুলেছেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। আধুনিক গীতিকবিতার বৈশিষ্ট্যগুলি হল—

প্রথমত:

গীতিকবিতা হল কবির একান্ত ব্যক্তিগত ভাবাবেগের প্রকাশ। এধরণের কবিতায় যে কোন বিষয় সম্পর্কে কবি তাঁর আবেগ উচ্ছ্বাস, চিন্তা ভাবনা প্রকাশ করে থাকেন।

দ্বিতীয়ত:

গীতিকবিতায় কবির একান্ত ব্যক্তিগত ভাবাবেগ প্রাধাণ্য পেয়ে যখন সেই ভাবাবেগ কবিতা দ্বারা প্রকাশিত হয় তখন তা আর কবির নিজস্ব ভাবাবেগ থাকেনা, কবির প্রকাশকলার গুনে সর্বজনীন হয়ে ওঠে। তাই গীতিকবিতা কবির একান্ত হৃদয়গত সম্পদ হলেও তার একটা সর্বজনীন মূল্য থাকে।

তৃতীয়ত:

গীতিকবিতা কবির একান্ত আত্মগত ভাবনা একথা ঠিকই। কিন্তু কবি তাঁর অনুভবের তীব্রতাকে সংবেদনশীল ভাষা ও সুরের অন্তর্লীন স্পর্শ দ্বারা প্রকাশ করেন ফলে তা পাঠক চিত্তকে অভিভূত করে তোলে।

চতুর্থত:

গীতিকবিতায় কবির নিজস্ব ভাবনা সর্বজনীনতা লাভ করে জন্য তা পাঠককেও অভিভূত করে তোলে। ফলে এধরণের কবিতায় কবি ও পাঠকের মধ্যে এক নিবিড় সংযোগ গড়ে ওঠে। কবি ও পাঠকের এই নিবিড় রস সংযোগ গীতিকবিতার প্রধাণ আকর্ষণ।

পঞ্চমত:

গীতিকবিতায় কবির ব্যক্তিগত ভাবোচ্ছ্বাস প্রকাশিত হয় জন্য এধরণের কবিতা অনেকটাই আবেগ বহুল। স্বাভাবিকভাবেই আবেগবহুল কবিতায় পরিণত চিন্তার অতটা ছাপ থাকেনা। ফলে কবিতাগুলি অতটা বাস্তব ঘেষা হয় না। এখানে কবি কল্পনাই বেশি গুরুত্ব পায়।

ষষ্ঠত:

গীতিকবিতা আকারে সংহত ও সংক্ষিপ্ত হয়। ফলে এই সংহত সংক্ষিপ্ত আয়তনের মধ্যেই শব্দ-ছন্দ-সুর-তান-ব্যঞ্জনার সুষম সমন্বয় ঘটাতে হয়।

সর্বোপরি গীতিকবিতা প্রেম, প্রকৃতি, স্বদেশপ্রীতি, ধর্মীয় বা ভক্তিমূলক ইত্যাদি নানা বিষয় নিয়ে রচিত হতে পারে। স্বাভাবিকভাবে বিষয়ের পরিবর্তনের সাথে সাথে কবিতার বৈশিষ্ট্যের ও কিছুটা হেরফের ঘটে। তবে আধুনিক গীতিকবিতা বলতে বোঝায় আকারে ছোট, পরিচ্ছন্ন, ব্যক্তিহৃদয়ের কোন একটি চিন্তা বা ভাবনা বা অনুভূতি প্রকাশের সুরেলা কবিতাকে।

ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলা গীতিকাব্যের শ্রেণীবিভাগ

যে কবিতায় কবি তাঁর একান্ত ব্যক্তিগত আবেগ অনুভূতিকে এক সাবলীল ও আন্তরিক গীতিপ্রবণ ভাষায় ব্যক্ত করেন তাকে গীতিকবিতা বলে। সুতরাং গীতিকবিতা হল সব দেশের, সব সাহিত্যের আকারে ছোট, পরিচ্ছন্ন, ব্যক্তি হৃদয়ের কোন একটি মাত্র চিন্তা, ভাব, অনুভূতি প্রকাশক সুরেলা কবিতা। এ ধরণের কবিতায় কবির নিজস্ব কোন চিন্তা, ভাব বা অনুভূতির প্রকাশ হয়। আবার অনেক সময় গীতিকবিতায় কবি কোন চরিত্র কল্পনা করে সেই চরিত্রের একান্ত একক কোন ভাব বা অনুভূতিকে সুললিত ভাষা ও মধুর ছন্দে প্রকাশ করে থাকেন। কবির 'Intense Personal Emotion'-ই গীতিকবিতার মূল কথা।

বিশ্বসাহিত্যে বহুদিন থেকেই কবিতার মাধ্যমে কবির ব্যক্তিগত ভাব অনুভূতি প্রকাশিত হয়ে আসছে। যদিও মধ্যযুগে রচিত বাংলা সাহিত্যের বৈষ্ণব পদাবলীর পদগুলিতে গীতিকবিতার নানা লক্ষণ ফুটে উঠেছে, তবুও অনেকের মতে বাংলা গীতিকবিতার প্রকৃত সূচনা ইংরেজ আমলে— ঊনবিংশ শতাব্দীতে। এই সময় মধুসূদন, তারপর বিহারীলাল, রবীন্দ্রনাথের মত অসংখ্য কবিদের হাতে গীতিকবিতা বিকাশ লাভ করেছে। স্বাভাবিকভাবেই গীতিকবিতায় নানা বৈচিত্র্য এসেছে। গীতিকবিতার এই বৈচিত্র্যের দিকে দৃষ্টি রেখে ঊনবিংশ শতাব্দীর গীতিকবিতা গুলিকে বেশ কয়েকটি ভাগে ভাগ করা যায়—

১) ঈশ্বরভাবমূলক কবিতা, ২) প্রকৃতি প্রেমমূলক কবিতা, ৩) ব্যক্তিগত প্রেম ও উচ্ছ্বাসের কবিতা, ৪) ওড বা স্তোত্রমূলক কবিতা, ৫) শোক ও দুঃখ নির্ভর কবিতা, ৬) দেশাত্মবোধক কবিতা, ৭) রূপকধর্মী কবিতা, ৮) হাস্যরসাত্মক কবিতা, ৯) সনেট, ১০) ব্যঙ্গাত্মক কবিতা প্রভৃতি।

গীতিকবিতার এই বিভাগগুলির মধ্যে একটি বিভাগ সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে আমরা ওড বা স্তোত্রমূলক কবিতা সম্পর্কে আলোচনা করব।

ওড হল এমন এক ধরণের গীতিকবিতা যা বিষয়বস্তুর দিক থেকে গভীর, স্তবক বন্টনে ও কবিতার আকারে দীর্ঘ এবং কোন জীবিত অথবা মৃত ব্যক্তি বা কোন প্রাকৃতিক বস্তু বা অবস্তুর ভাবকে সম্বোধন করে লেখা হয়। ওডের জন্ম প্রাচীন গ্রীসে। সেখানে প্রথম বাদ্যযন্ত্র সহযোগে গান করার উদ্দেশ্যে এই জাতীয় কবিতাগুলো লেখা হত। প্রাচীন গ্রীসের ওড রচয়িতাদের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হলেন পিন্ডার।

গ্রীসের ওডগুলিতে পরপর তিনটি স্তবক থাকত। সম্মেলক, গায়কগন প্রথমে মঞ্চের বাঁদিকে ঘুরে ঘুরে প্রথম স্তবক গাইতেন— একে বলা হত স্ট্রোফি (Strophe), এরপর দ্বিতীয় স্তবকটি গাইতেন ডানদিকে ঘুরে ঘুরে— একে বলা হত অ্যান্টি-স্ট্রোফি (Anti-Strophe), এবং সবশেষে তৃতীয় স্তবকটি গাইতেন সবাই এক জায়গায় দাঁড়িয়ে— একে বলা হত ইপোড (Epode)। কবিতা দীর্ঘ হলে স্তবক সংখ্যা বেড়ে যেত। কিন্তু পুরোনে ওডে এই তিনটি বিভাগ সর্বদাই মেনে চলা হত।

পরবর্তীকালে সময়ের পরিবর্তনের সাথে সাথে ওডেরও নানা বিবর্তন ঘটেছে। গ্রীসের প্রাচীন তিনটি রীতি এখনও মেনে চলা হয়। তবে জনসন এদের নতুন নামকরণ করেছেন। এই নতুন নামকরণ গুলি হল যথাক্রমে— Turn, Counter Turn এবং Stand. আগেই বলেছি প্রাচীন গ্রীসের ওডের রচয়িতা হলেন পিন্ডার। তাঁর পরে ওড লিখেছেন রোমান কবি হোরেস, ইংরেজ কবি জন মিলটন, আব্রাহাম কলি, গ্রে, কলিন্স, স্পেনসার প্রমুখেরা। আধুনিক যুগে ইংরেজি সাহিত্যে ওড রচনা করে জনপ্রিয় হয়েছিলেন শেলি এবং কীটস্। শেলির 'Ode to the West Wind', কীটস্-এর 'Ode on a Greecian Urn' প্রভৃতি খুবই জনপ্রিয় কবিতা। এরা দু'জন ছাড়াও আলেকজান্ডার পোপ, ওয়ার্ডসওয়ার্থ, টেনিসন প্রমুখেরাও ওড রচনা করে কৃতিত্ব দেখিয়েছেন।

বাংলা সাহিত্য ওড জাতীয় কবিতা খুব জনপ্রিয় না হলেও ঊনবিংশ শতাব্দীতে এবং তার পরে অনেকেই এধরণের কবিতা লিখে কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। যেমন মধুসূদনের 'চতুর্দশপদী কবিতাবলী'র 'কপোতাক্ষ নদ', 'বসন্তে একটি পাখির প্রতি', 'শ্যামা পক্ষী', 'ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর' 'বঙ্গভাষা' প্রভৃতি কবিতায় ওডের লক্ষণ আছে। বিহারীলাল চক্রবর্তীর 'বঙ্গসুন্দরী' বা 'নিসর্গ সন্দর্শন' দীর্ঘ রচনা হলেও এগুলিতে ওডের লক্ষণ আছে বলে অনেকেই মনে করেন। তবে বাংলা সাহিত্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ওডগুলি লিখেছেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। তাঁর 'মহুয়া' কাব্যে 'নাম্নী' শীর্ষক কবিতাগুলি এ ব্যাপারে উল্লেখযোগ্য রচনা। এছাড়াও 'বসুন্ধরা', 'সমুদ্রের প্রতি', 'ক্যামেলিয়া', 'পৃথিবী', 'বর্ষশেষ' প্রভৃতি রবীন্দ্রনাথের বিখ্যাত সব ওড জাতীয় কবিতা। রবীন্দ্রনাথের পরে বাংলা সাহিত্যে লেখা ওড জাতীয় কবিতাগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের 'নবপন্থা', সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের 'বুদ্ধপূর্ণিমা', মোহিতলাল মজুমদারের 'পান্থ', জীবননান্দ দাশের 'সুচেতনা', সঞ্জয় ভট্টাচার্যের 'নীলিমাকে' প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

সনেট

সনেট শব্দটি এসেছে ইতালিয় শব্দ 'Sonnetto' থেকে; যার অর্থ 'মৃদুধ্বনি'। চতুর্দশ শতকে প্রথমে ইতালিতে এবং তারপর বিভিন্ন দেশে সনেট লেখার প্রচলন শুরু হয়। এই সনেট হল গীতিকবিতার একধরণের প্রজাতি। এখানে সংযত ও সংহত ভাবে কবি মনের একটি অখন্ড ভাবকল্পনা রূপ লাভ করে। সনেট সাধারণত সমদৈর্ঘ বিশিষ্ট ১৪টি পঙ্‌ক্তিতে রচিত হয়। তবে অনেক সময় সনেটে ১৪টিরও বেশি পঙ্‌ক্তি থাকে। সনেটের সংজ্ঞায় বলা যায়— সমদৈর্ঘের ১৪টি পঙ্‌ক্তিতে ও একটি বিশেষ রীতিতে যখন কবিমনের একটি অখন্ড ভাবকল্পনা কাব্যরূপ লাভ করে তখন তাকে সনেট বলে।

উপরিউক্ত সংজ্ঞাটি থেকেই বোঝা যায় সনেটে ১৪টি পঙ্‌ক্তিতে কবিমনের একটি অখন্ড ভাবকল্পনা প্রকাশিত হয়। এই ১৪টি পঙ্‌ক্তিকে আবার দু'টি অংশে ভাগ করা হয়— অষ্টক (Octave) এবং ষটক (Sestet)। এর মধ্যে ষটক অর্থাৎ প্রথম আট পঙ্‌ক্তিতে প্রশ্ন কিংবা বিবরণের মাধ্যমে কবিতার ভাব বস্তুর

আভাস দেওয়া হয়। আর ষটকে পূর্বেকার প্রশ্ন বা অবতারণার উত্তর বা সমাপ্তি সূচিত হয়। বিশ্বসাহিত্যে বহুদিন থেকেই সনেট রচিত হয়ে আসছে। সনেটের বৈশিষ্ট্যগুলি হল—

প্রথমত:

সনেটে সাধারণত ১৪টি পঙ্‌ক্তি থাকে এবং প্রত্যেক পঙ্‌ক্তিতে ১৪টি অক্ষর বা মাত্রা থাকে। তবে কখনও কখনও ১৪টির কম বা বেশি পঙ্‌ক্তিতে সনেট রচিত হয়। সাহিত্যে ১৮ বা তারও বেশি মাত্রায় সনেট রচিত হয়েছে।

দ্বিতীয়ত:

সনেটে একটি মাত্র ভাব বা একটি মাত্র বস্তুকে নিয়ে কবিকল্পিত ঘটনা বা বিষয়বস্তুর পূর্ণ ও এবং স্বতন্ত্র প্রকাশ থাকে। স্বাভাবিকভাবেই সনেট বাহুল্য বর্জিত হয়।

তৃতীয়ত:

সনেটের একটি সুউচ্চ মহিমা ও গাম্ভীর্য থাকে। এখানেই গীতিকবিতার সাথে সনেটের পার্থক্য। গীতিকবিতার তরল ফেনিল উচ্ছ্বাসের সাথে সনেটের কঠিন বন্ধনজাত সংহতিতে মিল থাকেনা।

চতুর্থত:

সনেটে যে ভাব, চিন্তা ও অনুভুতির প্রকাশ ঘটে তার মধ্যে পারম্পর্য থাকা একান্ত প্রয়োজন। এখানে শিথিলতার সামান্যতম স্থান থাকেনা।

পঞ্চমত:

সনেট ১৪ মাত্রার ১৪টি পঙ্‌ক্তিতে রচিত হয় জন্য এর চরণগুলি দীর্ঘ হয় এবং লয় ধীর হয়। তাই এখানে মিশ্রকলাবৃত্ত বা অক্ষরবৃত্ত ছন্দই অনুসরণ করতে হয়।

ষষ্ঠত:

সনেটে মিশ্রকলাবৃত্ত ছন্দের কারণেই একটি সঙ্গীত প্রবাহ থাকে, যা পাঠককে অভিভূত করে। তবে অবশ্যই প্রভাব সংযত ও সংহত হয়।

আজ পর্যন্ত পৃথিবীতে মোট তিনটি রীতিতে সনেট রচিত হয়েছে— ক) পেত্রার্কীয় রীতি বা ইতালিয় রীতি, খ) শেক্সপীয়রীয় রীতি বা ইংরেজি রীতি এবং গ) ফরাসি রীতি। এছাড়াও মিশ্ররীতির সনেটেরও অস্তিত্ব লক্ষ্য করা যায়।

সনেটের জন্ম ইতালিতে। ইতালিয় কবি দান্তে (দিভাইন কমেডির রচয়িতা) প্রথম সনেট রচনা করলেও একে জনপ্রিয় করে তোলেন কবি পেত্রার্ক। তাই ইতালিয় রীতির সনেটগুলিকে পেত্রার্কীয় রীতির সনেট নামে অভিহিত করা হয়। পেত্রার্কীয় রীতির সনেটে অষ্টক চার পঙ্‌ক্তির দু'টি চতুস্ক (Quatrain) দ্বারা বিভক্ত। এদের মিলবিন্যাস হল 'কখ খক', 'কখ খক'। আর ষটক দু'টি ত্রিপদিকা (Terset)-এ বিভক্ত। এদের মিলবিন্যাস হল 'গঘঙ গঘঙ' বা 'গঘগ ঘগঘ' অথবা 'গঘঙ ঘগঙ'।

পরবর্তীকালে ইংরেজি সাহিত্য সনেট রচনায় কৃতিত্ব দেখান শেক্সপীয়ার। এ কারণেই ইংরেজি সাহিত্যের সনেটগুলি শেক্সপীয়রীয় রীতির সনেট নামে পরিচিত। তিনি পেত্রার্কীয় রীতির অষ্টক ও ষটক রীতির পরিবর্তে ১৪টি পঙ্‌ক্তিকে তিনটি চতুস্ক ও একটি সমূল দ্বিপদিকায় বিভক্ত করে সনেট রচনা করেন। শেক্সপীয়রীয় রীতির মিলবিন্যাস হল 'কখ কখ', 'গঘ গঘ', 'ঙচ ঙচ' 'ছছ'।

আর ফরাসি রীতির সনেট অনেকটাই পেত্রার্কীয় রীতির মত। এখানে অষ্টকের চারটি করে পঙ্‌ক্তি নিয়ে দু'টি চতুস্ক গঠিত হয়। কিন্তু ষটকের ক্ষেত্রে প্রথমেই থাকে একটি সমিল দ্বিপদিকা বা দোঁহা বা Couplet, পরে থাকে একটি চতুস্ক।

বাংলা সনেটের ক্ষেত্রে পাশ্চাত্য রীতির অনুসরণ করা হয়েছে। বাংলা সাহিত্যে প্রথম সার্থক সনেট রচনা করেন মধুসূদন দত্ত। তাঁর সনেটগুলি 'চতুর্দশপদী কবিতাবলী' গ্রন্থে সংকলিত আছে। মধুসূদন সনেটের ক্ষেত্রে কখনও পেত্রার্কীয় রীতি, আবার কখনও বা শেক্সপীয়রীয় রীতি গ্রহণ করেছেন। তবে বেশ কিছু ক্ষেত্রে তিনি উভয় রীতি মিশিয়ে মিশ্ররীতির সনেট লিখেছেন। মধুসূদন ছাড়াও যোগেন্দ্রনাথ সেন, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, প্রমথ চৌধুরী, মোহিতলাল মজুমদার, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, জীবনানন্দ দাশ প্রমুখেরাও সনেট রচনা করে বাংলা সনেটের ভান্ডারকে সমৃদ্ধ করেছেন।

গাথাকাব্য

গীতিকবিতা যখন একটি কাহিনি কেন্দ্রিক রূপলাভ করে সাধারণভাবে তখনই তা হয়ে ওঠে গাথাকাব্য। গাথাকাব্যে ঘটনা বা চরিত্র চিত্রণ পরিলক্ষিত হলেও তা পরিবেশিত হয় কবিতার আদলে। সংস্কৃত সাহিত্যে গাথা বলতে কিছুটা স্বতন্ত্র্য বিষয়কে বোঝায়। পিতৃপুরুষের কথা বা পুরাতন ঘটনা কিংবা কোন কিছুকে মনে রাখার জন্য লোকমুখে প্রচলিত শ্লোকনিবদ্ধ রচনার নাম গাথা।

সাধারণভাবে মনে করা হয় ইংরেজি Ballad-এর বাংলা প্রতিশব্দ গাথা। Ballad কথাটি এসেছে ল্যাটিন শব্দ Ballare যার অর্থ নৃত্য। যে কাহিনি কাব্যে কবিতার উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে নৃত্য পরিবেশন করা হয় প্রাচীন কালে তাকেই বলা হত ব্যালাড। কিন্তু গাথাকাব্যে সহজ সরল কাব্যরস সমৃদ্ধ সাধারণ মানবজীবনের গল্পকথা অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ। সুতরাং ব্যালাড এবং গাথাকাব্যের মধ্যে অনেকাংশে মিল থাকলেও দু'টি সম্পূর্ণ অভিন্ন নয়। পল্লীগীতি এবং লোককাব্যকেও গাথা বলা হয়— অবশ্য যদি তার মধ্যে গল্প থাকে। গাথাকাব্যের বৈশিষ্ট্যগুলি হল—

প্রথমত:

গাথাকাব্যে থাকে এক শিশুসুলভ সারল্য, জীবনের সহজ ও মৌলিক বৃত্তিগুলি প্রায় নির্বিচারে এখানে স্থান পায়। সহজ-সরল কথ্যভাষা রীতিতে গাথাকাব্যের কাহিনি বর্ণনা করা হয়।

দ্বিতীয়ত:

গাথাকাব্যে শিশুসুলভ সারল্য থাকে জন্য সম্ভবত একানে প্রচুর নাটকীয় উপাদান ব্যবহার করা হয়। শ্রোতা ও পাঠক বিশ্বাস ও অবিশ্বাসের প্রতি বিশেষ মাথা না ঘামিয়ে এই নাটকীয় উপাদান উপভোগ করেন। একটি নাটকীয় পরিস্থিতির সৃষ্টি, তা থেকে উদ্ধার পাওয়া এবং তারপরে আর একটি নাটকীয় উত্তেজনা সৃষ্টি-– এইরকম রুদ্ধশ্বাস পরিস্থিতির সৃষ্টি করে গাথাকাব্যের কাহিনি এগিয়ে চলে।

তৃতীয়ত:

গাথাকাব্য নাটকীয় উপাদানে পূর্ণ থাকলেও তা উপস্থাপন করা হয় বর্ণনাত্মক রীতিতে। কবিরা এখানে কাহিনি বর্ণনার দিকেই বেশি নজর দেন।

চতুর্থত:

গাথাকাব্য হয় নৈর্বক্তিক। এখানে কোন একটি বিশেষ জাতির আশা-আকাঙ্ক্ষার কথা প্রকাশ করা হয়। ব্যক্তিজীবনের সুখ-দুঃখের কথা এখানে যেমন বিশেষ থাকেনা, তেমনি ব্যক্তিগত মানসিকতা খুঁজে পাওয়া যায়না।

পঞ্চমত:

গাথাকাব্য জনপ্রিয় কোন কাহিনিকে নির্ভর করে গড়ে ওঠে। আর সেই কাহিনিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য নানা চরিত্রের সৃষ্টি করা হয়।

ষষ্ঠত:

গাথাকাব্য গীত হবার উদ্দেশ্যে রচিত হয়, তাই গাথাকাব্য ছোট ছোট স্তবকে বিভক্ত থাকে। তবে বিষয়বস্তু ও কবির প্রবণতা অনুযায়ী এই স্তবক ভেদের মধ্যে পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়।

বাংলাসাহিত্যে মধ্যযুগ থেকেই গাথাকাব্য রচনা করার প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। এই সময়কার গাথাকাব্যের উপাদানগুলি ছিল ধর্মনির্ভর কাহিনি, জনশ্রুতি এবং ঐতিহাসিক কিংবদন্তী। মধ্যযুগে 'গোরক্ষবিজয়', 'ময়নামতির গান' প্রভৃতি গাথাকাব্য রূপে আত্মপ্রকাশ করে। এছাড়াও হরপার্বতীর কথা, নাথসিদ্ধদের কথা, রাধাকৃষ্ণের কাহিনি প্রভৃতি গাথাকাব্যের আদলেই মধ্যযুগে রচিত হয়েছে। অষ্টাদশ শতাব্দীর 'ময়মনসিংহ গীতিকা' ও 'পূর্ববঙ্গ গীতিকা'-ও বাংলা গাথাসাহিত্যের উৎকৃষ্ট নিদর্শন।

আধুনিক বাংলাসাহিত্যে রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, নবীনচন্দ্র সেন প্রমুখ কবিরা গাথাকাব্য ধর্মী রচনা প্রকাশ করেছিলেন। স্বর্ণকুমারী দেবী ও সুরেন্দ্রনাথ মজুমদারও আধুনিক কালে গাথাকাব্যধর্মী রচনা লেখার প্রয়াস করেছেন। রবীন্দ্রনাথের 'মানসী' কাব্যের 'সিন্ধুতরঙ্গ' কবিতাটি বহুলাংশে গাথাকাব্যধর্মী কবিতা। এছাড়াও তাঁর 'কথা ও কাহিনী' কাব্যের বেশ কয়েকটি কবিতায় গাথাজাতীয় কবিতার নিদর্শন আছে। এরমধ্যে দু'টি উল্লেখযোগ্য কবিতা হল 'বন্দিবীর' ও 'পণরক্ষা'। 'বন্দিবীর' কবিতায় রবীন্দ্রনাথ মোগল ও শিখ দ্বন্দ্বের পটভূমিকায় বীরত্ব ও আত্মবলিদানের এক উদ্দীপক নাট্য আখ্যান পরিবেশন করেছেন পরপর অন্ত্যমিলযুক্ত চরণে, বিভিন্ন আকৃতিযুক্ত নাতিদীর্ঘ স্তবকে, আখ্যাণের যাবতীয় খুঁটিনাটি বর্ণনাসহ। আর 'পণরক্ষা' কবিতায় মারাঠা রাজপুতদের দ্বন্দ্বের ঐতিহাসিক প্রেক্ষিতে আজমীরগড়ের রাজপুতবীর দুর্গেশ দুমরাজের আত্মোৎসর্গ বর্ণিত। রবীন্দ্রনাথের 'মহুয়া' কাব্যের কবিতাগুলিও গাথাকাব্যের রীতিতে রচিত। এছাড়াও বুদ্ধদেব বসু টেনিসনের 'The Ballad of Ociana' কাব্যের অনুসরণে লিখেছিলেন তাঁর 'কঙ্কাবতী' কাব্যটি। এখানে গাথাকাব্যের যথেষ্ট বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে।